সাত আসমান : দেশভাগের প্রেক্ষিতে একটি মানবমনের স্বপ্নের মায়াজাল রচনা ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা

Apurba Pahar*

* Dept. of Bengali, Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, Kolkata, W.B-700074, India.

email- paharapurba2011@gmail.com

Abstract

প্রাক্-স্বাধীনতার পর্ব থেকেই 'দেশভাগ' জনিত যে কানাঘুষো শব্দটি অখণ্ড ভারতবাসীর হৃদয়ে এক গোঙানির সুরে রনিয়ে উঠছিল; সেই সুরের-ই এক ভয়ংকর পরিণতি দেখতে পেলাম 'ভারত বিভাজনে'। যে দেশ বা যে অঞ্চলকে মানুষ এতদিন আপনার ভেবে এসেছিল বংশপরম্পরায়, সেই নাড়ীর সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিযায়ী পাখির মতো অন্যত্র আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করার কাজটি একেবারেই সহজ ছিল না। কতটা যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মানুষকে সে বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছে, দেশত্যাগ করতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তেমন-ই এক স্বপ্নচ্যুত মানুষের ভালো-লাগা— মন্দ-লাগা নির্ভর আখ্যান শামিম আহমেদের 'সাত আসমান' উপন্যাসটি। এক রৈখিক নয়, ভিন্ন চিন্তা ভাবনার আলোকে তিনি যে রচনাটি নির্মাণ করলেন, সে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু স্বপ্নপিয়াসী জর্মান মিঞা। মুর্শিদাবাদের সালারে নিজের পাকাপোক্ত আশ্রয় গড়ে তুলে নিজেকে দেশভাগের অংশী করে নিশ্চিন্তের ঘুম ঘুমাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তব তাকে ঠেলে দিয়েছে স্বপ্নভঙ্গের অনিবার্য পরিণতিতে। তাই এখন সেই নির্মম বাস্তবতার হাত ধরেই জর্মান মিঞাকে ফিরে যেতে হচ্ছে তার জন্মভূমি বীরভূমের চেনা গলি, চেনা রাস্তা ও চেনা জীবনযাপনের আড়ালে।

Keywords : দেশভাগ, স্বাধীনতা, বাস্তুত্যাগ, হিন্দু-মুসলমান, স্মৃতিচারণ, বেদনাবিধুর, স্বপ্নপিয়াসী মন, কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান, নিরুৎসাহী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আত্মদ্বন্দ্ব, ভাগ্যবিপর্যয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থল, স্বপ্নভঙ্গের-যন্ত্রণা।

মূল প্রবন্ধ :

|| এক।।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভাজনের রাজনীতি স্বাধীনতা লাভের আগেই আমরা দেখে থাকি; ইতিহাস একথাকে মান্যতাও দেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে এই বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল দেশবাসীর মনে। ভারতবর্ষ তথা আ মরি আমার বাংলায় এ কোন স্বাধীনতা পেলাম আমরা? ইংরেজ সরকার

খুব সজ্ঞানে দেশবিভাগ রূপ বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে গেল ভারতবর্ষের মাটিতে। দেশবিভাগের অভিশাপ বিভক্ত করল জনজাতির মনন-চিন্তন-ভালোবাসা; একার্থে সকল কিছুকেই। স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত দেশভাগ একই মুদ্রার যেন এপিঠ আর ওপিঠ। স্বাধীনতা, দেশভাগ— এগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে উদ্বাস্তু সমস্যা। ইতিহাসের বোধহয় সব থেকে বড়ো দেশভাগও এইসময়ে ঘটে যায়— প্রায় কোটি দুয়েক মানুষ বাস্তুত্যাগ করে বা করতে একপ্রকার বাধ্য হয়। দেশভাগকে কেবলমাত্র আঞ্চলিক সীমারেখায় ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন বা ইচ্ছাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলার বিষয়টি। দেশভাগের যন্ত্রণা কিংবা যন্ত্রণার যে পাশবিক তিক্ত অভিজ্ঞতা, তা চাইলেই বোধহয় ভোলা যায় না আর এ সকলের মধ্য দিয়েই আমাদের বিপুল সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে যায়।

'দেশভাগ' হলে কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবন আলোড়িত হতে থাকে, এমনটি নয়। কারণ দেশভাগ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্কের রসায়ন। বিশদে ভাবলে কখনো কখনো সে বিষয়টি 'হিন্দু ও মুসলমানের সমস্যা' হিসেবেও পরিগণিত হয়। আর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় ভাবনার স্তরে এই বিষয়টিও কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। পাশাপাশি এই উপেক্ষা সাম্প্রদায়িকতাকে ছাড়িয়ে কখনো কখনো মনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিষয়টি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে সমালোচক সোহিনী ঘোষের মন্তব্যে। সমালোচক ঘোষ বলেছেন—

> "হিন্দু মুসলমানের বাহ্যিক আচারকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে— আশ্চর্য, যে প্রতিবেশীর মনকে তত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীদের যে মন অন্যের জন্য কাঁদে— ধর্ম বিচার করে না, সম্প্রদায় বিচার করে না—সে মনও তো ছিল! রাজনীতি সে মনকে গুরুত্ব দেয়নি।"[১]

দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে, তার বহুমুখী অভিঘাত, মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও যন্ত্রণাকাতর নানাবিধ দিক নিয়ে সব দেশেই গল্প, উপন্যাস, নাটক— বিবিধ সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। দুই বাংলাতেও পার্টিশন সাহিত্যের সম্ভার বেড়েই চলেছে। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও অন্যান্য ধরনের রচনা নির্মিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিমবঙ্গে পার্টিশন সাহিত্য বা দেশভাগকে কেন্দ্র করে একাধিক রচনা সৃষ্টি হয়েছে, নির্মিত হয়েছে একাধিক উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' (অমরেন্দ্র ঘোষ), 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়), 'কেয়াপাতার নৌকা' (প্রফুল্ল রায়), 'গড় শ্রীখণ্ড' (অমিয়ভূষণ মজুমদার),

'আবহমানকাল' (অসীম রায়), 'খণ্ডিতা' (সমরেশ বসু), 'পূর্ব-পশ্চিম' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), 'দেশ-মাটি ও মানুষ' (গৌরকিশোর ঘোষ) ইত্যাদি। পূর্ব-পাকিস্তানে 'রাঙ্গা প্রভাত' (আবুল ফজল), 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' (আবু জাফর শামসুদ্দিন), 'সূর্য দীঘল বাড়ি' (আবু ইসহাক), 'উত্তরণ' (সত্যেন সেন), 'সংসপ্তক' (শাহীদুল্লা কায়সার), 'যাপিত জীবন' (সেলিনা হোসেন) ইত্যাদি রচনাগুলি দেশভাগ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

দেশভাগকে নিয়ে বহুমানুষের যন্ত্রণা আছে, হতাশা আছে— আছে স্মৃতিচারণের অনেকটা আবেগ জুড়ে। দেশভাগকে বিষয় করে দুই বঙ্গে একাধিক রচনা রচিত হয়েছে। কখনো রচনাগুলিতে উঠে এসেছে দেশভাগকে কেন্দ্র করে মানুষের অভিজ্ঞতা, হিংসা, তজ্জনিত অপরাধ বোধ। আবার কখনো দেশভাগ পরবর্তী বেদনাবিধুর স্মৃতিকাতরতা উপন্যাস বা আখ্যানের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এই দেশভাগকে কেন্দ্র করে শামিম আহমেদ লিখেছেন 'সাত আসমান'। উপন্যাসটিতে কথাকার আহমেদ দেশভাগের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। কাহিনিতে তুলে এনেছেন দেশভাগের পর মানুষের সামাজিক জীবন চিত্র। দেশভাগের প্রসঙ্গকে ছাড়িয়ে কথাকার আহমেদ দেশভাগের পূর্ববর্তী মুহূর্ত থেকে দেশভাগ হওয়া পর্যন্ত সময় প্রবাহকে ধরে একটি মানুষের (জর্মান মিঞা) মনের বিচিত্র গতিপ্রবাহ—তার চাওয়া—তার প্রাপ্তি—তার অপ্রাপ্তি—তার স্বপ্নভঙ্গের চিত্রকে আঁকলেন অভিনব আঙ্গিকে। জাদুবাস্তবতা ও স্বপ্ননির্ভর মনের বিচিত্র প্রবাহকে তিনি কাহিনির বা ঘটনা প্রবাহের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করলেন। উপন্যাসটি পাঠে দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বারংবার কৃষ্ণজাদু বা শুভ্রজাদু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সমগ্র কাহিনি জুড়ে।

।। দুই।।

'সাত আসমান' উপন্যাসটির কাহিনি স্বপ্নের বিচিত্র প্রবাহ, জাদু বাস্তবতা, শুভ্রজাদু, কৃষ্ণজাদুকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে জর্মান মিঞা। পার্টিশন সাহিত্য বা দেশভাগকে কেন্দ্র করে যে সকল উপন্যাস, ছোটোগল্প কিংবা বিবিধ রচনা রচিত হয়েছে, সেগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। 'সাত আসমান' উপন্যাসটিও দেশভাগকেন্দ্রিক। আমরা দেশভাগের সাহিত্যে সাধারণত দেশভাগকে কেন্দ্র করে মানুষের নানাবিধ কষ্টের মুহূর্ত-অভিজ্ঞতা-হিংসা-অপরাধবোধের বর্ণনা পেয়ে থাকি। কখনো কখনো দেশভাগ পরবর্তী বেদনাতুর স্মৃতিচারণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে দুই বাংলার অনেক সাহিত্য। কিন্তু কথাকার শামিম আহমেদের এই উপন্যাসটিতে দেশভাগকে কেন্দ্র করে আখ্যান এগিয়েছে একটু ভিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। উপন্যাসটির মূল

চরিত্র জর্মান মিঞা। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই মূলত কাহিনির ওঠানামা। চরিত্রটির স্বপ্নপিয়াসী মন ও বিচিত্র সব স্বপ্নের পরিবেশ কাহিনিতে নূতনত্ব এনেছে।

উপন্যাসটির শুরুতেই দেখা যায়, রাজনৈতিক আবহে মানুষ দ্বিধাবিভক্ত। মূলত মুসলিমরা মুসলিম লিগের পক্ষ নিয়েছে, অন্যদিকে হিন্দুরা বেছে নিয়েছে কংগ্রেসকে। জর্মান মিঞা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। যখন মুসলিমরা মুসলিম লিগের পক্ষ নিচ্ছে, তখনও তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল। ধর্মীয় বাতাবরণে যখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান; এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত হতে চলেছে অখণ্ড ভারতবর্ষ; সেই বিষয়টি লেখকের কলমে ভাষা পায় এই রূপে—

> "কেন, মুসলমানরা ভারত ছাড়বে কেন, ভারত কি ওনার একার পৈতৃক সম্পত্তি! জর্মান মিঞার শরীরে রাগ কিলবিল করে।"[২]

লেখকের ভাষাতেই কেবলমাত্র উঠে আসে বলাটা বোধহয় সমীচীন নয়, জর্মান মিঞার মত এক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা মুসলিম হয়েও মনে প্রাণে ভারতবাসী। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নিয়ে যখন গোটা দেশ উত্তাল— উত্তাল আপামর ভারতবাসী। উদ্বেগ সঞ্চারিত হয় মানুষের মধ্যে, কথাকারের লেখনীতে পাই—

> "দেশভাগ হলে তুমি-আমি বাপ দাদার ভিটে আর আইমার জমি ছেড়ে কোথায় যাব বলো তো?"[৩]

উৎকণ্ঠার পাশাপাশি অনিশ্চয়তাও প্রকাশ পায়। এই অনিশ্চয়তা ধরা পড়ে জর্মান মিঞার চোখে মুখে, 'জর্মান মিঞা ভেবে পায় না তাঁর গন্তব্য কোথায়?'

পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস থেকে সরে আসেন জর্মান মিঞা এবং মুসলিম লিগের জোরদার সমর্থক হয়ে ওঠেন। তিনি পাকিস্তানেই নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কাটাবেন বলে মনস্থির করে বসেন। কোন পাকিস্তান? দেশভাগের পর মুর্শিদাবাদের সালার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি এই আশায় বুক বেঁধে বীরভূমের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের সালারে গিয়ে বসবাস শুরু করতে চান আর সালার যখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তিনি নিজেকে একজন পাকিস্তানি বলে পরিচয় দেবেন। খাদিমের কানের কাছে মুখ নিয়ে কখনো তিনি বলে ওঠেন, 'পাকিস্তানের লেগে দোওয়া মাঙতে হবে বাপজান'। তিনি মনে করেন, সালারের গোস্ত আর বিড়ির স্বাদ যারা পায়নি, তাদের জীবন অসমাপ্ত। তিনি আরও মনে করেন, সালার যদি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তো পোয়া বারো। স্বগতোক্তির সুরে তার মনরূপ ফল্গুনদীতে বয়ে চলে এরূপ ঢেউ—

> "এই জেলা কোনওদিন হিন্দুস্থানের মধ্যে থাকবে না... পাকিস্তান হলে মুর্শিদাবাদ, মালদা ঢুকবেই।"[৪]

এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানের বাসিন্দা হওয়ার পাশাপাশি তিনি এও ভাবেন, দেশভাগ হওয়ার আগেই সালারে কিছু জমি জায়গা কিনে নেওয়া— বাড়ি বানিয়ে নেওয়া এবং তার সঙ্গেই এখানে থেকে গেলে; পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সীমা বিভাজনে তিনি পাকিস্তানি হবেন কিন্তু বাড়িচ্যুত হবেন না— ভিটেচ্যুত হবেন না এবং এগুলিই তার বিশেষ পাওয়া। বরং দেশভাগের যন্ত্রণাকে সরিয়ে রেখে তার খোয়াবগুলি আরও মধুর হয়ে উঠবে।

জর্মান মিঞা জানেন জগতে তিন ধরনের খোয়াব আছে। সেগুলি হল— রহমানি, নফসানি আর শয়তানি। জর্মান মিঞার দেখা খোয়াবগুলি এই নফসানি জাতের। এই খোয়াব মানুষের ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়। সালার ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন রেজাউল করিম ও সরোজ রায়চৌধুরী। জর্মান মিঞার জেলা বীরভূমে করিম সাহেবের আদি বাড়ি। ইংরেজির মাস্টারমশাই রেজাউল করিম খুব ভালো পড়ান। ওই স্কুলের-ই বাংলা মাস্টার সরোজ রায়চৌধুরীর বাড়ি পাশের গ্রাম মালিহাটিতে। সরোজ রায়চৌধুরী জর্মান মিঞার কাছে স্কুলের তরফ থেকে প্রস্তাব দেন, 'শুনেছি আপনি শিক্ষিত মানুষ, ভাল আরবিও জানেন— আমাদের স্কুলে পড়াবেন?' জর্মান মিঞা এ ব্যাপারে নিরুৎসাহী হয়ে কথার মোড়কে অন্যদিকে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসু চোখে বলেন, 'কী বুঝছেন, নতুন সরকার কেমন হল? লিগ নিশ্চয় ভাল সরকার চালাবে কী বলেন?' প্রশ্নটি সরোজবাবুকে করলেও প্রত্যুত্তরে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর দেন করিম সাহেব। তিনি বলে ওঠেন—

> "কেমন আর হবে মিঞা! লিগের সরকার কি কখনও ভাল হয়! বাংলার মুসলমান পাকিস্তান চায় বলে লিগকে জিতিয়েছে। আমরা তো ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলাম। ইংরাজের চাল থেকে বের হতে না পারলে দেশে আবার দাঙ্গা বেধে যাবে মিঞা! একটা দাঙ্গা থেকে আমাদের শিক্ষা হয়নি।"[৫]

জর্মান মিঞা পাকিস্তানের বাসিন্দা হতে চান— 'বন্দেমাতরম' শব্দে তার আপত্তি— তিনি মুসলিম লিগ আর মুসলমানদের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন। কিন্তু দাঙ্গার বীভৎসতাকে তিনি ভয় পান। তার এইসব খুন খারাবি ভালো লাগে না। কথাকার শামিম আহমেদের বর্ণনায় ধরা পড়ে—

> "জর্মান মিঞার এইসব খুন-খারাবি ভালো লাগে না। খুন আর মারামারির মধ্যে পাকিস্তান হওয়ার চেয়ে ইংরেজ শাসনে থাকা ঢের ভালো।"[৬]

১৯৪৬-এর দাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দাঙ্গার কথা। জর্মান মিঞা যেন আত্মদ্বন্দ্বে ভোগেন। স্বগতোক্তির সুরে তার কণ্ঠ থেকে যেন এক অন্য সুর ধরা পড়ে—

> "তা হলে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লিগে ঢোকায় কি তাঁর বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটল!"[৭]

দূরদেশে জর্মান মিঞার নিজের গ্রামের কথা ভীষণ মনে পড়ে। তিনি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অনুশোচনায় ভুগতে থাকেন। কথাকারের বর্ণনায় তা এমনভাবে উঠে আসে—

> "এই অভাগা দেশে তিনি কেন এলেন? শুধু কি পাকিস্তানের জন্য! কিন্তু সেই আশা তো সুনিশ্চিত নয়।"[৮]

উপন্যাসটির আদ্যপ্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে উপলব্ধ হয়, জর্মান মিঞার সাহস নেই, আর বীরত্বের তো প্রশ্ন-ই ওঠে না। জর্মান আসলে ভিতরে গুটিয়ে থাকা একটি মানুষ। কলকাতার দাঙ্গা এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও চোরাগোপ্তা মারপিট যত্রতত্র দেখা দিচ্ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তার আঁচ লেগেছে। খেটে খাওয়া মানুষ যারা, তাদের অনেকে মারা গিয়েছে, কেউ বা নিখোঁজ; তবে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে ফিরে আসছে। এদের দেখে জর্মান মিঞা বিব্রত বোধ করে। কথাকারের বর্ণনায় উঠে আসে—

> "দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, দাঙ্গা কাটিয়ে সে সব মানুষ বেঁচে আছে, তাদের দেখে জর্মান মিঞা অবাক হন। স্বপ্ন বুকে আঁকড়ে তাদের কেউ কেউ পাকিস্তানের জন্য অপেক্ষা করছে। সকলেই অবশ্য নয়। বহু মানুষ খেতে পায় না, তাদের কাছে পাকিস্তান-প্রস্তাব যেন তাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া উপহাস।"[৯]

গরিব মানুষের কাছে উপহাস হলেও জর্মান মিঞার ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তবটা তেমন নয়। বরং তার মধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার উন্মাদনা আছে— আছে ভীষণ ভালোলাগা। উপন্যাসে দেখি—

> "জর্মান মিঞার শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ হতে থাকে। তিনি এই রাতের, মানে শবে কদরের ফজিলত পড়বেন বলে কিতাব খুলে বসেন।"[১০]

আসলে এই রাত তার কাছে মনে হয় ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের রাত। তার আরও মনে হয়, সমগ্র মানবজাতি ও জগতের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে এই 'বিশেষ রাত'।

বীরভূম থেকে চলে আসার পর জর্মান মিঞার মনটা একেবারেই ভালো ছিল না। তবু সেই এলাকায় এসে জর্মান মিঞা বাসা বেঁধেছেন শুধুমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, এই আশা নিয়ে এবং তিনি সেই রাষ্ট্রের বাসিন্দা হতে চান হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। কেবলমাত্র পাকিস্তান ভাবনা ছাড়া তার তেমন কোনো কাজ নেই।

'সাত আসমানের' চিন্তার পাশাপাশি তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবলগ্ন নিয়ে নানা কথা ভাবতে থাকেন। তার ভাবনায় একে একে জড়ো হয়—

> ''পঞ্জাবের 'পি', আফগান অঞ্চলের 'এ', কাশ্মীরের 'ক', ইস্টবেঙ্গলের 'ই', সিন্ধুপ্রদেশের 'এস' আর বালুচিস্তানের 'তান'— এই নিয়ে তৈরি হয়েছে স্বপ্নের দেশ পাকিস্তান। এই নামের অর্থ হল পবিত্র দেশ। ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা পড়েছে। অতএব তিনি এখন পাকিস্তানের বাসিন্দা।''[১১]

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট সত্যি সত্যিই দেশ স্বাধীন হল। জর্মান মিঞার ধারণা-ই সত্যি হল। মুর্শিদাবাদ, মালদহ জেলা প্রত্যাশা মতোই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জর্মান মিঞা যেন এক আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

কামরুন্নেসা জর্মান মিঞার আনন্দকে সংশয় ও দ্বিধায় পরিণত করলেন। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সীমানা নিয়ে দু'জনের মধ্যে চলল জরুরি কথোপকথন।

কামরুন্নেসা : দুটো দিন সবুর করেন মিঞা সাহেব! তারপর বুঝবেন কোনটা পাকিস্তানে ঢুকল আর কোনটা ভারতে!

জর্মান মিঞা : কেন?

কামরুন্নেসা : মুসলমানপ্রধান জায়গাগুলো যদি পাকিস্তানে যায় আর হিন্দুপ্রধান এরিয়া ভারতে, তা হলে চট্টগ্রাম পাকিস্তানে ঢোকে কী প্রকারে। এই জেলা হিন্দু বা মুসলমানপ্রধান নয়। ... দু'দিন সবুর করেন মিঞা।

জর্মান মিঞা : মানে আবার নতুন করে ভাগ হবে? আমরা যে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ালাম, এই মুর্শিদাবাদ কি পাকিস্তানে থাকবে না?

কামরুন্নেসা : তা আমি জানি না। শুনেছি, পাকিস্তান হিন্দুপ্রধান খুলনা চাইছে আর ভারত মুর্শিদাবাদকে হাতছাড়া করতে চায় না। দুই পক্ষ রাজি হলে আমি-আপনি কী করতে পারি বলেন? কংগ্রেস যদি মালদা-মুর্শিদাবাদকে ভারতে রাখতে চায়, তাহলে তা কে রুখবে!

জর্মান মিঞা : মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে গেলে কংগ্রেসের কোন পাকা ধানে মই পড়বে শুনি?

কামরুন্নেসা : শুনছি, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির রাস্তা হিসাবে মালদা জেলা ভারতের দরকার। আর হুগলি নদীকে বাঁচানোর জন্য মুর্শিদাবাদ আর নদীয়া জেলার প্রয়োজন।

আসলে জর্মান মিঞা ও কামরুন্নেসার কথোপকথনের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে যায়, বহু মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গের তীব্র যন্ত্রণা। যে আশা নিয়ে জর্মান মিঞা বীরভূম ছেড়ে এখানে আসেন, সেই আশাকে না পাওয়ার জন্য জর্মান মিঞার মতো বহুমানুষ যন্ত্রণার শিকার। অন্যদিকে কামরুন্নেসার উপলব্ধি ও উদ্বেগ জাতি ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষের জন্য বলেই মনে হয়। কামরুন্নেসার মতো ব্যক্তি মানুষের কথা সমষ্টির হয়ে দাঁড়ায়। কামরুন্নেসার কণ্ঠে শোনা যায়—

> "এই দেশভাগ এক দোজখযন্ত্রণা মিঞাসাহেব। কত মানুষ এ-পার ও-পার করবে, কত লোক ভিটেমাটি হারাবে, তা গুনে শেষ করা যাবে না।...আল্লাহতালা যা ভাল বুঝবেন তাই হবে।"[১২]

দেশভাগের বাস্তব বড়ো কঠিন। অনেক ব্যক্তির জমি জায়গা সম্পত্তির খানিকটা হিন্দুস্থানে, খানিকটা পাকিস্তানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উপন্যাসটিতে আমান মিঞার কথা বলা যেতেই পারে। তার বাড়ির বাইরে পুরুষদের পায়খানা ঘরটি মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান সীমান্তে। তাঁর অনেক জমি মুর্শিদাবাদ ও অনেক জমি বর্ধমানে। প্রশ্ন ওঠে, সীমানার ভাগে তিনি কোনদিকে পড়বেন? হিন্দুস্থান না পাকিস্তানে? বাস্তবের সঙ্গে পরিবর্তনের যেন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জর্মান মিঞা তার জীবন অভিজ্ঞতায় অনুভব করেন, মানুষ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। স্বগতোক্তির সুরে তিনি যেন বলে ওঠেন—

> "ওয়াসেফ আলি মির্জার সঙ্গে বহু মানুষ ছিল যারা পাকিস্তান চায়নি। পতাকা উড়তে না উড়তেই মুর্শিদাবাদের মুসলমান দলে দলে পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।"[১৩]

জর্মান মিঞা ভাবেন, এত লোক যদি সমর্থন করে, তাহলে পাকিস্তানের বাইরে কিছুতেই মুর্শিদাবাদকে রাখা যাবে না। একথাও ঠিক, কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, পাঞ্জাবের কিছু জায়গাতেও একইরকম সমস্যার উপদ্রব চলছে।

শেষপর্যন্ত কামরুন্নেসার ইচ্ছা বলি ইচ্ছা, আশঙ্কা বলি আশঙ্কা; ১৭ আগস্ট রবিবার মুর্শিদাবাদ আবার ভারতের ভৌগোলিক সীমানায় ফিরে এল। জর্মান মিঞা পড়লেন ভারী বেকায়দায়। তার মনের অন্তর্কোণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলে। তার মানসিক চাপান-উতোরকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন কথাকার শামিম। তিনি বললেন—

> "এবার কি তাঁকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যেতে হবে? মুর্শিদাবাদ পাকিস্তান হবে বলে তিনি এসেছিলেন। যদি ভারতেই থাকতে হয়, তাহলে এই জেলায় কেন থাকবেন তিনি!

নিজের জায়গায় ফেরত যাবেন। ঘরের ছেলের ঘরে ফেরাই মঙ্গল।"[১৪]

জর্মান খুব ধীর-স্থিরভাবে ঠিক করলেন, তিনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যাবেন। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন নিজগ্রামে। কিন্তু তার বাস্তবোচিত উপলব্ধি দেখে পাঠক বিস্মিত হয়। উপন্যাসে দেখি—

> "...গ্রামে ঢোকার আগে বহু কথাই মনে আসছে তাঁর। দুর্ভিক্ষের কিছু আগে হঠাৎ করে মোটা চালের কেজি দু'আনা থেকে চার আনা হয়ে যাওয়াতে গরিব মানুষরা খেতে পাচ্ছিল না, তাদের ছেলে মেয়েদেরও ভাত দিতে পারছিল না।... মুর্শিদাবাদ চলে আসার পর প্রায়ই মৃত্যুর খবর আসত। রোজ কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। এই মৃত্যুর সারির মধ্যে দেশে স্বাধীনতা এল। তামাম এলাকার মানুষ খেতে পায় না। এদিকে পতাকা উড়ছে সারি সারি। ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। ও পার থেকে ভারতেও বহুলোক আসছে। এই আসা-যাওয়া স্বাধীনতার ফল। আর খেতে না পাওয়া কীসের ফল তা জর্মান মিঞা জানেন না।"[১৫]

জর্মান মিঞার মধ্যে কেবলমাত্র বাস্তবোচিত উপলব্ধি নয়। তার মধ্যে গভীর পরিণতবোধও লক্ষ করা যায়। কথাকারের কলমে উঠে আসে—

> "কচু তুলে নেওয়ার পর জমিতে যে সামান্য গেঁড়ো পড়ে থাকে, তা খোঁজার জন্য জমিতে নেমে পড়ে শয়ে শয়ে বুভুক্ষুর দল। জর্মান মিঞা নিজের চোখে দেখেছেন। গ্রামের গরিব মানুষদের খাওয়ার কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এইসব লোকজনের কাছে স্বাধীনতার কী মানে, তা বোঝা যায় না। যদি এমন হত, এই স্বাধীনতা তাদের খেতে দেবে, তা হলে তার একটা অর্থ থাকত। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান যে দেশেই তারা থাকুক না কেন! এদের ভাতের ব্যবস্থা কি কোনও লাটসাহেব বা মন্ত্রীর দল করে দিতে পারে!"[১৬]

সদর্থে স্বাধীনচেতা জর্মান মিঞা স্বাধীন পাকিস্তানের বাসিন্দা হতে চেয়েছিলেন। ইসলামকে ভালোবেসে পাকিস্তানে বাস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের মাটিকে ছাড়তে চাননি। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের তরণী বেয়ে তার কাছে ধরা দিত। স্বপ্ন একদিন বাস্তবও হল। দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। তিনি পাকিস্তানে থাকতে চাইলেও ভারতবর্ষের পবিত্র মাটিকে ত্যাগ করতে চাননি। কিন্তু বাস্তব তো বড়ো কঠিন, বাস্তব তার স্বপ্নের মায়াজাল, স্বপ্নের মোহকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে আরও সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করালো। যখন তিনি জানলেন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান হলেও মুর্শিদাবাদ ভারতবর্ষের অধীন থাকবে তখন তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি নানা স্মৃতিকে সঙ্গী করে তার গ্রামে ফিরতে চাইলেন। তার নিজের বাড়িতে ফিরতে চাইলেন।

একে একে তিনি যেন স্পর্শ করছেন স্কুলবাড়ি, গ্রাম, নিজের বাড়ি, পারিবারিক কবরস্থান। মানুষ লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে গেলে যেমন নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তেমনি জর্মান মিঞাও নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে বাঁধতে পারলেন না। কথাকার তার এই উপন্যাস শেষ করেছেন এইরূপে—

> "জর্মান মিঞা মোষ হাঁকানোর লাঠিটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি হাঁকাতে থাকেন। নিজস্ব মকামে পৌঁছানোর জন্য এই শেষ পথটুকু তাঁকে যে করেই হোক অতিক্রম করতে হবে। গাড়োয়ানের জায়গায় বসে জর্মান মিঞা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।"[১৭]

।। তিন।।

দেশভাগ নিয়ে একাধিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। বহু রচনা বহুমুখী জীবনকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে। তবে একথা অবশ্যই বলা চলে, যে প্রান্ত বা যে আঙ্গিক দিয়েই কথাকাররা বা সাহিত্যিকরা দেশভাগের কাহিনিকে উপস্থাপন করুক না কেন, তা মানব মনের বিষাদঘন দিককে নির্দেশ করে। সমালোচক সোহিনী ঘোষের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন—

> "দেশভাগের বিষয়ে কোনো আলোচনাই তাই হয়ে থাকতে পারে না একরৈখিক। যে জটিল বুননে দেশভাগ-এর ঘটনা গাঁথা, সে জটিল বয়ন দু-এক রেখায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।"[১৮]

একদম-ই তাই। দেশভাগের বিবিধ রচনার আঙ্গিক সাহিত্যিক ভেদে বিভিন্ন রকম হতেই পারে বা হতেই হবে। ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু এক হলেও কাহিনি সৃজিত হয় রচয়িতাদের নব নব ভাবনায়, নব নব কৌশলে। কখনো 'হারানো দেশ'-এর সন্ধান চলে অন্তরাত্মায়। কখনো বা বিভিন্ন রচয়িতা ছিন্নমূল জীবন ও তাদের যন্ত্রণাকে বিষয় করে তাঁর আঙ্গিক নির্মাণ করেন। কেউ বা উদ্বাস্তু জীবনের details কে তাঁর রচনার বিষয় করেন। এই বিষয়ে সমালোচক মননকুমার মণ্ডলের মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বলেন—

> "উত্তর প্রজন্মের পাঠকের কাছে 'পার্টিশন' এক অপরতার বোধ নিয়ে আসে। ছিন্নমূল জীবন, উদ্বাস্তু, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কল্পনায় 'হারানো দেশ'-এর সন্ধান, নারীর আশ্চর্য নীরবতা, নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ভৌগোলিক স্থানান্তরণের নির্মম অমানবিক বৃত্তান্ত— সমস্ত কিছুই পার্টিশন ন্যারেটিভে এক অভিনব 'অপরতা' নিয়ে আসে..."[১৯]

দেশভাগের সাহিত্যে বহুবিধ লেখক বহুকৌণিকে তাঁর রচনার স্কেচ করেন। ভিন্নমুখীপ্রবাহে সেগুলির বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রচনাগুলিতে দেশত্যাগের স্মৃতিকাতরতা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নানান মানুষের

বহুবিধ অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতার ডালিকে পূর্ণ করে। কথাকার শামিম আহমেদের এই উপন্যাসটি 'দেশভাগ'-এর বোধকে এক অন্য পর্যায়ে উন্নীত করে। কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি চরিত্রটির আদ্যন্ত পাঠককে শুধু ভাবায়-ই নয়, বিস্মিত করে রাখে। দেশভাগ-এর প্রেক্ষিতে 'সাত আসমান' এক অভিনব সৃষ্টি, একথা নির্দ্বিধায় বলাই যায়।

তথ্যসূত্র :

১. সোহিনী ঘোষ, 'ভাগের গল্প, যোগের গল্প', পরিকথা 'বাংলা ছোটগল্পের বিস্তার', দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), ষোড়শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০১৪, পৃ ২৩৯

২. শামিম আহমেদ, 'সাত আসমান', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১২, পৃ ১৫

৩. তদেব, পৃ ৯

৪. তদেব, পৃ ২৭

৫. তদেব, পৃ ৫৬

৬. তদেব, পৃ ৭১

৭. তদেব, পৃ ৬৭

৮. তদেব, পৃ ৭৮

৯. তদেব, পৃ ৭৯

১০. তদেব, পৃ ৮০

১১. তদেব, পৃ ৮২, ৮৩

১২. তদেব, পৃ ৯৫

১৩. তদেব, পৃ ৯৭

১৪. তদেব, পৃ ৯৮

১৫. তদেব, পৃ ১০৩

১৬. তদেব।

১৭. তদেব, পৃ ১০৪

১৮. সোহিনী ঘোষ, 'ভাগের গল্প, যোগের গল্প', পরিকথা 'বাংলা ছোটগল্পের বিস্তার', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৪২

১৯. মননকুমার মণ্ডল, 'চলমান-পার্টিশান : উত্তর-প্রজন্মের ভাবনা', 'উজাগর', পার্টিশন-মানবাধিকার-গনতন্ত্র ও সাহিত্য সংখ্যা, উত্তম পুরকাইত (সম্পা), ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৩, পৃ ৫৩